যুগান্তর

তারিখ ... 15 JUL 2012 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

শরীফুজ্জামান আগা খান

এমপিওভুক্তির ক্ষেত্রে সরকারের নীতি ভ্রান্ত

দেশে মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে নিম্নমাধ্যমিক-মাধ্যমিক বিদ্যালয়, কলেজ, কারিগরি এবং মাদ্রাসা মিলিয়ে ৭ হাজারের মতো স্বীকৃতিপ্রাপ্ত নন-এমপিও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে। এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কর্মরত শিক্ষক-কর্মচারীর সংখ্যা ১ লাখের মতো। স্বীকৃতিপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানগুলো এমপিওভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর মতো একই নীতি-নিয়মে পরিচালিত— অথচ শিক্ষক-কর্মচারীরা সরকার থেকে বেতন পান না। অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানের বয়স ১০-১২ বছর পেরিয়ে গেছে। এসব প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-কর্মচারীরা দুঃসহ মানবেতর জীবনযাপন করছেন।

স্বীকৃতিপ্রাপ্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো চলতি ২০১২-১৩ অর্থবছরে এমপিওভুক্তির আশায় ছিল; কিন্তু বাজেটে এ খাতে অর্থ বরাদ্দ দেখতে না পেয়ে তারা ক্ষুব্ধ ও হতাশ। সর্বকালের সর্বোচ্চ অংকের বাজেটে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপিওকরণের মতো গুরুত্বপূর্ণ খাতে বরাদ্দ রাখা হয়নি। অগত্যা তারা অধিকার আদায়ের জন্য পথে নেমেছেন। আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত রীতি হল— কোন দেশের জিডিপির শতকরা ৬ ভাগ শিক্ষা খাতে বরাদ্দ থাকবে। সেখানে আমাদের দেশে এ বরাদ্দ মাত্র ২.৬ ভাগ। আর বাজেটের হিসাবে ২০ শতাংশের বেশি শিক্ষা খাতে বরাদ্দ থাকার কথা থাকলেও এ অর্থবছরে বরাদ্দ মাত্র ১১.৫ শতাংশ। এরকম বরাদ্দ সরকারের শিক্ষাবিরোধী দৃষ্টিভঙ্গির পরিচায়ক। বাজেট ঘিরে বিভিন্ন পর্যায়ের শিক্ষক সংগঠন দাবি-দাওয়া উত্থাপন করছে। এসব সংগঠনের চাহিদা অনুযায়ী গুরুত্ব বিচারে নন-এমপিও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপিওকরণের দাবিটি সর্বাধিক অগ্রাধিকার পাওয়ার যোগ্য। কারণ এ অর্থবছরে এমপিও করা না হলে অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আর্থিক অসচ্ছলতার দরুন একে একে বন্ধ হতে থাকবে। তেমনটি ঘটলে মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা ব্যবস্থায় সুদূরপ্রসারী বিরূপ প্রভাব পড়বে।

সংসদ সদস্যরা সংসদে নন-এমপিও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এমপিও চেয়ে থাকেন। ২০১১ সালেও তারা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে এমপিওভুক্তির তালিকা জমা দিয়েছিলেন। কিন্তু নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপিও করা হয়নি। জানা যায়, সংসদ সদস্যদের তাগাদার পরও কেবল অর্থমন্ত্রীর বিরোধিতার কারণে এ খাতে বরাদ্দ মেলেনি। সংখ্যাগরিষ্ঠ সংসদ সদস্যদের মতামতের ভিত্তিতে সংসদে কোন প্রস্তাব গৃহীত হবে সেটাই বিধেয়। সংসদ সদস্যরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্তিতে অর্থ বরাদ্দ চাইছেন অথচ একজন ব্যক্তির বিরোধিতার মুখে বিষয়টি আটকে যাচ্ছে; এটা কোন ধরনের গণতান্ত্রিক রীতি হল! সংসদে কী প্রক্রিয়ায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় সেটাই এখানে প্রশ্ন হিসেবে উঠে আসে।

কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রাথমিক অনুমোদনের পর তিনটি বছর সফলভাবে পরিচালিত হলে স্বীকৃতি লাভ করে। স্বীকৃতিপ্রাপ্ত সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপিও পাওয়ার নৈতিক দাবিদার। সংসদ সদস্যদের চিন্তাভাবনাও তাই সব এমপিও প্রত্যাশী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ঘিরে আবর্তিত হওয়া সঙ্গত। চলতি অর্থবছরে একযোগে সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত হবে সেটাই এখনও সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রত্যাশা করে। স্বীকৃতিপ্রাপ্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে কিছুসংখ্যক প্রতিষ্ঠান বাছাই করতে গেলে নানা ধরনের বিপত্তি দেখা দেয়। ৬ বছর অপেক্ষার পর ২০১০ সালে সর্বশেষ এমপিওভুক্তির তালিকা তৈরি করা হয়। ৭ হাজার বৈধ আবেদন থেকে নির্বাচিত তালিকা নিয়ে তখন বিতর্কের ঝড় ওঠে। তালিকার ব্যাপারে অনেক মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী এবং এমপির ক্ষোভের মুখে সমালোচিত শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ যাবতীয় নথিপত্র প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা উপদেষ্টা আলাউদ্দিন আহম্মদের কাছে পাঠিয়ে দেন। এমনকি তিনি পদত্যাগ করতে পর্যন্ত উদ্যত হন।

> সংসদ সদস্যরা সংসদে নন-এমপিও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এমপিও চেয়ে থাকেন। ২০১১ সালেও তারা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে এমপিওভুক্তির তালিকা জমা দিয়েছিলেন। কিন্তু নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপিও করা হয়নি। জানা যায়, সংসদ সদস্যদের তাগাদার পরও কেবল অর্থমন্ত্রীর বিরোধিতার কারণে এ খাতে বরাদ্দ মেলেনি।

তারপরও ওই সময়ে এমপিওভুক্ত ১,৬১২টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নির্বাচন প্রক্রিয়া নিয়ে বিতর্ক থেকেই যায়। দেখা যায়, কয়েকজন প্রভাবশালী মন্ত্রী এবং সংসদ সদস্য নিজ জেলায় কয়েক ডজন করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত করালেও বেশির ভাগ জেলায় ২-৫টির বেশি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত হয়নি।

এমপিও প্রত্যাশী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর এমপিওভুক্তির অধিকার প্রশ্নবিদ্ধ করতে অর্থমন্ত্রী এবং শিক্ষামন্ত্রীকে মাঝে মধ্যে বিরূপ মন্তব্য করতে দেখা যায়। পাবলিক পরীক্ষায় খারাপ ফলাফল করা কিংবা স্বল্পসংখ্যক শিক্ষার্থীর এমপিওভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উদাহরণ টেনে তারা এমপিও প্রত্যাশী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর অধিকার প্রশ্নবিদ্ধ করেন। এখানে কথা হল, একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতির মেয়াদ ২-৩ বছর। এরপর প্রতিষ্ঠানের সার্বিক মান মূল্যায়ন করে তবেই আবার স্বীকৃতি নবায়ন করা হয়। এখন কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পাবলিক পরীক্ষার ফলাফল যদি একাদিক্রমে খুবই খারাপ হতে থাকে কিংবা শিক্ষকের সংখ্যা থেকে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছাপিয়ে যায়, তবে ওই ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতি আটকে দেয়ার ভেতর দিয়েই ব্যবস্থা নেয়া সম্ভব। কোন একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের টিকে থাকার মতো বাস্তবতা না থাকলে ওই প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-কর্মচারীদের পার্শ্ববর্তী বড় কোন প্রতিষ্ঠান (সমূহের) অঙ্গীভূত করে ফেললে কেউ তাতে আপত্তি করবে না।

এমপিও প্রত্যাশী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে কিছুসংখ্যক প্রতিষ্ঠান বাছাই করতে গেলে অসুস্থ বাতাবরণ তৈরি হয়। সংসদ সদস্যরা কোন প্রতিষ্ঠান রেখে কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম তালিকায় দেবেন সে হিসাব করতে গিয়ে হিমশিম খান। তখন যেনতেন রকমের দেনদরবার চলে। বড় অংকের উৎকোচের বিনিময়ে হলেও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপিও করার জন্য মরিয়া চেষ্টা চলে। গুরুত্বপূর্ণ কার্যালয়গুলো ঘিরে দালাল চক্র সক্রিয় হয়ে ওঠে। এরা ঘুষের অংকের রেট নিলামে চড়ায়। ২০১০ সালে এমপিও ছাড়ার প্রাক্কালে এবং ২০১১ সালে এমপিও ছাড়ার সম্ভাবনার কথা শোনা গেলে অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গাত্রে/অগাত্রে ঘুষ দিয়ে এখনও বিপাকে পড়ে আছে।

দু-তিন দশক আগেও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনে ধনী মানবীয় ব্যক্তিরা ভূমিকা রাখতেন। বর্তমানে পরিস্থিতি পালটে গেছে। উচ্চ শিক্ষিত যুবকরা কর্মসংস্থানের প্রয়োজনে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনে এখন উদ্যোগী ভূমিকা নেন। কোন প্রতিষ্ঠানে ঢোকার প্রাক্কালে একজন শিক্ষক-কর্মচারীকে ২-৩ লাখ টাকা ডোনেশন দিতে হয়। এরপর ঘর, স্বীকৃতি এরকম কাজেও মোটা অংকের টাকা যায়। এরপর চলে অনিশ্চিত এমপিওভুক্তির ঘুষের পালা। স্বীকৃতিপ্রাপ্তির আগে প্রাথমিক অনুমোদনকালের মেয়াদ ৩ বছর। স্বীকৃতির পর অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ৮-১৫ বছর সময় পার করেছে। এভাবে অর্থ ও সময় হারিয়ে এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-কর্মচারীরা নিঃস্ব হয়েছেন।

স্বীকৃতিপ্রাপ্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর এমপিও ঝুলিয়ে রাখার বিপরীতে সরকারের নতুন নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অনুমোদন ও স্বীকৃতি দিয়ে চলা কতটা সুবিবেচনাপ্রসূত সেটাও ভেবে দেখার বিষয়। কিছু প্রত্যাশার ভেতর দিয়েই একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জন্ম নেয়। একটা সময়ে এসে প্রতিষ্ঠানটি এমপিও চাইবে সেটাই স্বাভাবিক। এখন সরকার যদি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভার বহনে অসম্মত হয় কিংবা অস্বস্তিবোধ করে তবে তো প্রতিষ্ঠানের জন্মদান প্রক্রিয়ায় বাদ সাধা দরকার। সচেতন দম্পতিরা পরিবারের সচ্ছলতার কথা ভেবে যেমন সন্তান সংখ্যা সীমিত রাখেন। অনুমোদন প্রক্রিয়া যথাযথ করা গেলে অনাকাঙ্ক্ষিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উদ্ভব সহজেই রোধ করা যায়।

বর্তমান সরকারের ঘোষিত একটি নীতি হল— প্রতি পরিবারে অন্তত একজন সদস্যের চাকরির ব্যবস্থা করা। স্বীকৃতিপ্রাপ্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-কর্মচারীরা নিজ যোগ্যতাবলে এক ধরনের কর্মসৃজন করে নিয়েছেন। এখন সরকারের কর্তব্য হবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত করে সত্যিকার চাকরি কার্যকর করা। নন-এমপিও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-কর্মচারীরা বিনা বেতনে অতি কষ্টে বছরের পর বছর সফলতার সঙ্গে প্রতিষ্ঠানের হাল ধরে আছেন। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো এমপিওভুক্ত হলে তারা প্রতিষ্ঠানের প্রতি অধিকতর মনোযোগী হবেন। তখন স্বভাবতই এসব প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার গুণগত এবং পরিমাণগত মান আরও বাড়বে। এমপিওভুক্তির ব্যাপারে সরকারের ভ্রান্ত নীতির অবসান হওয়া দরকার।

শরীফুজ্জামান আগা খান : *একটি এমপিও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান*